



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1099 - 1108

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

এক বঙ্গনারীর দৃষ্টিতে জাপান : হরিপ্রভা তাকেদা ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমাজ-সংস্কৃতি

মঞ্জুরী ঘোষাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: monjoreeg123@gmail.com

 0009-0006-1022-6400

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

হরিপ্রভা তাকেদা,
বঙ্গমহিলার জাপান
যাত্রা, ভারত-জাপান
সম্পর্ক, মেইজি যুগ,
ভ্রমণসাহিত্য, বাংলা
সাহিত্য, উয়েমেন
তাকেদা, সাংস্কৃতিক
বিনিময়, জাপানের
আধুনিকীকরণ,
নারীর ইতিহাস।

Abstract

This paper explores the historical and cultural significance of Hariprabha Takeda's travelogue, Bongomohilar Japan Jatra (A Bengali Woman's Journey to Japan), which documents her 1912 voyage to Japan with her Japanese husband, Uemon Takeda. As the first Asian woman to write a book on Japan, Hariprabha's narrative offers a unique bridge between early 20th-century India and Japan during the transformative Meiji and Taisho eras. The study contextualizes her journey against the backdrop of Japan's shift from the isolationist policies of the Tokugawa shogunate to its rapid modernization and emergence as a global power, a transformation that deeply inspired colonial India.

The text analyzes Hariprabha's detailed observations of Japanese social dynamics, categorized into three key dimensions: family life, religious culture, and the education system. It highlights her documentation of the fluidity of Japanese domesticity, where women were active economic participants, and her appreciation for the syncretic blend of Shintoism and Buddhism in daily life. Furthermore, the paper examines her admiration for Japan's practical, holistic education system that balanced academic rigor with vocational skills. Beyond a mere travel diary, the narrative illustrates the personal and political intersections of the time, touching upon the Takeda couple's involvement with Indian freedom fighters like Netaji Subhas Chandra Bose during World War II. Ultimately, this study positions Hariprabha Takeda not just as a traveller, but as a vital cultural conduit whose writings provide rare, non-Western perspectives on the socio-political evolution of Japan and the enduring diplomatic and emotional ties between the two nations.

Discussion

ভৌগোলিক পরিসরে জাপান ও ভারতবর্ষের জলপথের দূরত্ব প্রায় ৭৮৫৬ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়ার পূর্বতম দেশ জাপান ও দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারতের সঙ্গে প্রাচীন কাল থেকেই একপ্রকার মিত্রতাসুলভ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ভারত যেমন বিভিন্ন সময় জাপান দেশটির রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, তেমনি জাপান ও তার ঐতিহ্যের উৎস হিসেবে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে ভারতীয়-বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে। ধর্মীয় ভিত্তিতে বিচার করলে দেখব জাপান ও ভারত দুটি দেশের সম্পর্কের মূল সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছেন গৌতম বুদ্ধ এবং তার প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম।

জাপান দেশটির পূর্ব-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব জাপানে মেইজি যুগের শাসন শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ আড়াইশো বছর ধরে জাপানে প্রবর্তিত ছিল আইসোলেশন পলিসি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি। এই দীর্ঘ আড়াইশো বছর জাপান তোকুগাওয়া কুলের শাসনাধীন ছিল। জাপান নিজেদের অন্যান্য সকল দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনযাপন করত। বিদেশী কোন রাষ্ট্রকে জাপান দেশে বাণিজ্যিক বা ধর্মীয় কারণে আত্মস্থান করা হত না। জাপানের শাসকেরা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্যই রক্ষণশীলভাব ধারণ করেছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ১৬৩৯ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত জাপান আইসোলেশন পলিসি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। এই আইসোলেশন পলিসি অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতির মূলে যে সমস্ত নীতিগুলি কার্যকরী ছিল সেগুলি হল —

- ১) জাপান, খ্রিস্টধর্ম নিষিদ্ধ করেছিল।
- ২) জাপানের মানুষদের নিজের স্বদেশ ছেড়ে অন্যত্র বা অন্য দেশে যাবার কোন প্রকার অনুমতি ছিল না।
- ৩) বিদেশীদের সঙ্গে জাপান, কোনরকম বাণিজ্যিক সম্পর্কে লেনদেনের বিরোধী ছিল।
- ৪) তোকুগাওয়া শাসনকালে কোন বিদেশী শক্তি যদি বাণিজ্য করতে জাপানে ইচ্ছুক থাকতেন, তাহলে তা ছিল শাসকের অনুমতি সাপেক্ষ বিষয়। জাপানে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেছিল সে সময় ওলন্দাজ এবং পর্তুগিজরা কেবল মাত্র।

এ হেন বিচ্ছিন্নতাবাদী জাপানেও বিভিন্নসময় শাসকের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশীয়-নীতির পালাবদল ঘটে, দেশীয় ঐতিহ্যের নবনির্মাণ ঘটে। জাপানের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখব গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তোকুগাওয়া প্রশাসনের পতন ঘটছে এবং ১৮৬৮ সালের মেইজি সরকার প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। মেইজি যুগের সময়কাল থেকে জাপানের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের সূচনা বলা চলে। মেইজি যুগের সময়কাল থেকেই জাপান সমগ্র বিশ্বের বিশিষ্ট উন্নত দেশ রূপে জেগে ওঠে। মেইজি সরকার জাপানকে আধুনিক করে তোলার বিশেষ তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাই নতুন সরকার এলে তাঁরা আত্মস্থান জানান ‘সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী’ গড়ে তোলবার জন্য। জাপান অনুসরণ করতে শুরু করে বিশ্বের উন্নততম দেশগুলির (ইউরোপ, আমেরিকা) বলাই বাহুল্য তা অন্ধ-অনুকরণ নয়, রয়ে বসে বেছে বেছে ভালো ভালো দিকগুলির অনুসরণ ও সমাজে প্রবর্তন করার চেষ্টা চালায় জাপান। এই পর্বে দেখা যায় শিল্পপ্রযুক্তির উন্নতি ও শিক্ষা-বিকাশের সাহায্যের জন্য পাশ্চাত্য উন্নত দেশসমূহ থেকে বহু শিক্ষাবিদ এবং প্রকৌশলীকে আমন্ত্রণ করা হয় জাপানে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ জাপানিদের জীবনযাত্রার মধ্যেও পশ্চিমের প্রভাব পড়তে শুরু করে ধীরে ধীরে।

জাপানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। এই পর্বের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সম্রাটের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। এই সময় সম্রাটের পদে আসিন হন মুৎসিতো। সম্রাট সমগ্র শাসনতন্ত্রের প্রধান পুরুষ হলেও প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রীসহ রাজনীতিবিদেদের সক্রিয়ভাবে দেশ পরিচালনার কাজে অংশ নিতেন। সম্রাট ছিলেন মেইজি যুগের জাপানের নবযাত্রার প্রতীক এবং এই সময় থেকেই জাপানে সমকালীন সময় সম্রাটকে ধীরে ধীরে দেবতার মতো শ্রদ্ধা সম্মান দান করার রীতি ও প্রবর্তিত হয়। মুৎসিতো শাসনকালে, জাপান সামরিক শক্তিতে বলশালী হয়ে ওঠে। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে জাপান বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করে চীনের বিরুদ্ধে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে জাপান রাশিয়ার সঙ্গেও যুদ্ধে জয়লাভ করে শক্তিশালী দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়।

জাপান দেশটির সামরিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক কালের ভারতকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ভারত তখন ব্রিটিশ শাসনাধীন কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের অংশ না হয়েও প্রাচ্যের একটি দ্বীপ পরিবেষ্টিত দেশ

জাপান কীভাবে এত উন্নত করে নিজেদের গড়ে তুলল সেই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করতে বাংলার পুরুষ-নারী নির্বিশেষে জাপান দেশটিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই দেখা যায় জাপানে বিদেশী নীতির রদবদল ঘটে যাচ্ছে। মেইজি সরকার জাপানের অধিবাসীদের বিদেশ গমনের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে দেন। কাজুহিরো ওয়াতানাবে জানাচ্ছেন তাঁর প্রবন্ধে—

“১৮৮৬ সালে স্বয়ং সরকার ৬’শ জাপানি নাগরিককে অভিবাসী বা Emigrant হিসেবে হাওয়াই দ্বীপে পাঠাবার উদ্যোগ নিলে ২৮ হাজার লোক-এর জন্য দরখাস্ত পাঠায়।”^১

এই পর্বেই দেখা যায় জাপানের মানুষজন কর্মের জন্য, শিক্ষার জন্য অথবা আর্থিক উন্নতি লাভের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছেন। আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য হরিপ্রভা তাকেদার স্বামী উয়েমেন তাকেদাও দেখা যায় ভাগ্য অন্বেষণের তাগিদে বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কর্মসূত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও সেই সম্পর্ক থেকে উয়েমেন তাকেদা, হরিপ্রভা তাকেদার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন যা সমকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে দেখতে গেলে দুটি দেশকে এই দম্পতি অদৃশ্য সূত্রের বন্ধনে গেঁথে দিয়েছিলেন। International relations’-র ভিত্তিতেও ভারত ও জাপান সম্পর্কের চর্চিত ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন আধুনিক এই দুটি নারী ও পুরুষ। জাপান ভ্রমণ চর্চা প্রসঙ্গে আমরা হরিপ্রভা তাকেদার ভ্রমণ ও জীবন অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করব কিন্তু তার আগে হরিপ্রভার জাপান ভ্রমণের পূর্ব প্রেক্ষাপট রূপে জাপানের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থানটি একটু দেখে নেবো।

মেইজি যুগে জাপানিরা বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে উঠলে তাদের বিদেশে যাবার হার ও বৃদ্ধি পায়। কারণ হিসেবে কাজুহিরো ওয়াতানাবে ‘হরিপ্রভার দেখা জাপান’ প্রবন্ধে জানাচ্ছেন—

“চারপাশে সমুদ্র পরিবেষ্টিত দেশ জাপানের অধিবাসীরা অতীতকাল থেকেই সমুদ্র পাড়ে আগ্রহী ছিল। দ্বিতীয়ত, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিকূল আবহাওয়া-জনিত খারাপ ফসল, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক মন্দা তৎকালীন জাপানি সমাজে, বিশেষ করে কৃষি অঞ্চলের অর্থনীতিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই কারণে অনেক লোক গ্রামাঞ্চল ছেড়ে চলে যায় শহরে।... আবার অনেকে সমুদ্রের ওপারে পাড়ি জমায়। বিদেশে যাবার প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই ছিল উচ্চ বেতন বিদেশে...।”^২

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত ও জাপানের সম্পর্কসূত্র গভীরতার রূপ পেতে শুরু করে ধীরেধীরে। ভারত-জাপান সম্পর্কের মূলে অবশ্যই রয়েছেন যে মানুষটি, তিনি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু এই সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠার আগে থেকে দুই দেশের মানুষ সমৃদ্ধির টানে, অর্থনীতির কারণে বিভিন্ন সময়ে একে অপরের দেশে গিয়ে ভ্রমণ করেছেন। এবার প্রসঙ্গে আসে যাক হরিপ্রভা তাকেদার। বাংলা ও জাপান দুটি দেশের সম্পর্ক সূত্র স্থাপনে হরিপ্রভা তাকেদার ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। হরিপ্রভা তাকেদা হচ্ছেন জাপানের বাইরের প্রথম এশিয়ান নারী, যিনি জাপান সম্পর্কে প্রথম বই লিখে প্রকাশ করে গেছেন। হরিপ্রভা ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ঢাকা জেলার খিলগাঁও গ্রামে। হরিপ্রভার পিতা শশীভূষণের বাড়ি ছিল মূলত নদীয়ার শান্তিপুরে। সরকারি চাকরির সুবাদে তিনি উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে ঢাকায় চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিয়ে করেন নগেন্দ্রবালাকে, এবং পরের বছর তাঁরা যোগ দেন ব্রাহ্ম সমাজে। এরপর শশীভূষণের একক প্রচেষ্টায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অনাথ শিশুদের জন্য ‘উদ্ধারশ্রম’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তাঁরা। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানের নাম হয় ‘মাতৃনিকেতন’। হরিপ্রভা কোথায় পড়াশোনা করেছেন, আর কতদূরই বা পড়াশোনা করেছেন, সেসব প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, স্কুলে তিনি পড়েছিলেন। ধারণা করা হয়, হয়তো ঢাকা শহরের ইডেন স্কুলেই তিনি পড়েছিলেন, এন্ট্রান্স পর্যন্ত।

হরিপ্রভার জীবনসঙ্গী উয়েমেন তাকেদার জীবন ছিল বর্ণময়। তিনি সূদূর জাপান থেকে অবিভক্ত ভারত-বাংলাদেশে এসেছিলেন ভাগ্য অন্বেষণের তাগিদেই। উয়েমেন তাকেদা কারিগরী শিক্ষায় প্রশিক্ষিত এবং পেশায় ছিলেন একজন কেমিস্ট। তখনকার দিনে জাপানি সমাজে পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হত বড় ছেলে। তাই অনেক জাপানি ভাগ্যঅন্বেষণের জন্য পাড়ি দিতেন দূর-দূরান্তের দেশে। ঠিক তেমনই ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জন জাপানি নাগরিক ভারতে

আসেন কাজের খোঁজে, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন উয়েমেন। তিনি প্রথমে বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরিতে কেমিস্ট পদে যোগ দেন। পরবর্তীতে ঢাকায় নিজ ব্যাবসায় উন্নতি আশা-প্রকল্পে একটি সাবানের কারখানা শুরু করেন, ‘ইন্দো-জাপানিজ সোপ ফ্যাক্টরি’ নামে। সে সময় ঢাকা শহর প্রায় মফস্বলের সামিল ছিল। অবসর বিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থা ঢাকায় তখনও গড়ে ওঠেনি। সম্ভবত পরিবার-পরিজন ছাড়া একলা উয়েমেন তাকেদা নিজের মনের খোরাক যোগাতেই ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন। আর এই সূত্রেই মল্লিক পরিবারের সাথে তাঁর পরিচয় হয়ে থাকতে পারে। হরিপ্রভাদের অনাথ আশ্রম মাতৃনিকতনে উয়েমেনের যাতায়াত শুরু হয়। হরিপ্রভার সাথেও তাঁর পরিচয় বন্ধুত্ব থেকে প্রেম ও বিবাহে পরিণতি লাভ করে। পরিবারের সম্মতিতে ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে উয়েমেনকে বিয়ে করেন হরিপ্রভা। বিয়ের পর নামের শেষ থেকে ‘বসু মল্লিক’ পদবী উঠিয়ে পরিণত হন হরিপ্রভা তাকেদায়।

আন্দাজ করা যায়, উদারমনা ব্রাহ্ম হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিবাহ ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ থাকার ফলেই, শশীভূষণ উয়েমেনের সাথে তার মেয়ের বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন। তবে বিয়ে ঠিক কোন বছর হয়, এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কোথাও দেখা যায়, বিয়ের সময়কাল বলা হচ্ছে ১৯০৪, আবার কোথাও ১৯০৬ বা ১৯০৭। সম্ভবত এটিই ছিল কোনো বাঙালি নারীর প্রথম জাপানি বিয়ে। দুই দেশের মানুষের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিনিময়ে সে দিনের এই দম্পতির ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয় বিষয়। বিয়ের পর উয়েমেন তাঁর শ্বশুর শশীভূষণ বসু মল্লিকের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘ঢাকা সোপ ফ্যাক্টরি’। এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের কিছু অংশ ব্যয়িত হতে থাকে মাতৃনিকতনে অনাথ শিশুদের দেখভালের কাজে।

শোনা যায় উয়েমেনের নতুন কারখানা খুব বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। কয়েক বছর পরই আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে সেটি। হরিপ্রভার ভ্রমণবিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে উয়েমেন তাকেদা জাপান ছেড়ে আসার দীর্ঘ নয় বছর পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ রাখেননি। জাপানে সেই সময় রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সূচিত হয়েছিল। জাপানে মেইজি যুগের অবসান ঘটে শুরু হয়েছিল তাইশো যুগ। নতুন জাপান তাঁর পূর্বের দারিদ্র্য কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। দেশের এই পরিবর্তিত অবস্থা স্বচক্ষে দেখার বাসনা জাগে উয়েমেনের মনে। তাছাড়া উয়েমেন তাঁর পরিবার পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন নব দম্পতি হিসেবে তিনি ও হরিপ্রভা যেন পরিবার পরিজনের প্রীতি ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। আর সেই সূত্রেই হরিপ্রভা ও উয়েমেন তাকেদা জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে।

হরিপ্রভার জাপান ভ্রমণ নিয়ে রচিত ‘বঙ্গমিলার জাপানযাত্রা’ গ্রন্থে আমরা দেখি, হরিপ্রভা তাঁর স্বামী উয়েমেন তাকেদার সঙ্গে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ৩ নভেম্বর জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। যাত্রাপথে সূচনা হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজে করে গোয়ালন্দে আসার কথা। গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে করে তাঁরা কলকাতায় আসেন এবং কলকাতা থেকে জাহাজে করে জলপথে তাঁরা জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। হরিপ্রভা ভ্রমণবিবরণীর সূচনায় তাঁর জাপান ভ্রমণের আগ্রহের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

“আমার যখন বিবাহ হয় তখন কেহ মনে করে নাই যে আমি জাপান যাইবো। কাহারো ইচ্ছাও ছিল না। ...বিবাহের পর শ্বশুর-শাশুড়ির আশীর্বাদ লাভ করিতে ইচ্ছা হইত। তাহাদের নিকটে পত্র লিখিয়া যখন তাহাদের ফটো সহ আশীর্বাদপূর্ণ একখনি পত্র পাইলাম ও তাহারা আমাদের দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পত্র লিখিলেন, আমার প্রাণ তখন আনন্দে ভরিয়া গেল। তাহাদিগকে ও তাঁদের দেশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল।”^৩

হরিপ্রভা সম্ভ্রান্ত প্রগতিশীল পরিবারের কন্যা ছিলেন। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল সংসার যাপন ও গার্হস্থ্য জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা। সাধারণ বাঙালি নারীর চাহিদার মতই তিনি চেয়েছিলেন স্বামীর বাড়ি, সে সুদূর জাপানে হলেও তাঁর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হতে। তাই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা যখন স্বস্তীক জাপান যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে সময় দিনাজপুরের সহৃদয় মহারাজা বাহাদুর। তিনি ২৫ টাকা প্রেরণ করেছিলেন এই দম্পতিকে আবার ঢাকায় বসবাসকারী আরো এক জাপানি দম্পতি সওদাগর মিস্টার কোহরা তাদের উপহারসহ ৫০ টাকা প্রেরণ করেছিলেন।

হরিপ্রভা জাপান যাত্রায় পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের। হরিপ্রভার বর্ণনা থেকে দেখা যায় তাঁকে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা করতে তার মা-বাবা সহ তাঁর দুই ভগ্নী শান্তি ও খুকি পথ এগিয়ে দিয়েছিলেন। ৪^৮ নভেম্বর হরিপ্রভা ঢাকা থেকে কলকাতায় এলে তাঁরা ভারতে বসবাসকারী জাপানি পরিবার মিস্টার সিমিজসানের বাড়িতে আশ্রয় নেন। বলা চলে কলকাতা থেকেই হরিপ্রভার জাপানি পরিবারের দৈনন্দিন জীবন ও যাপনের রীতি-নীতি দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। হরিপ্রভা ও উয়েমেন কলকাতা ছেড়ে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগের মুহূর্তে জাপানী সিমিজসান ও হাতরিসান জাপান দেশ সম্পর্কে জানান—

“সুন্দর দেশ; আশা করি আপনি সুখী হইবেন।”^{৪৯}

দিনলিপি অনুসারে তাকেদা দম্পতির জাহাজ কলকাতা থেকে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ৫ নভেম্বর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উনিশ ও বিশ শতকের বিদেশকেন্দ্রিক ভ্রমণকাহিনীর বড় অংশ জুড়ে থাকে সমুদ্রযাত্রা ও জাহাজের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও নিয়ম-নীতির বিবরণ। হরিপ্রভার জাপান ভ্রমণ বিবরণীতেও তাঁর অন্যথা হয়নি। জাহাজের কেবিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে হরিপ্রভা জানাচ্ছেন—

“ঘরখানি বোধহয় ২ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া, ৫ হাত উচ্চতার চেয়ে কম ছাড়া বেশি নয়। আলমারির তাকের মত দুইটি করিয়া তিন দিকে ছয়টি তাক। প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া ৬জন থাকিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অসতর্ক হইয়া একটু উঁচু হইলে মাথায় খুব ব্যথা পাইতে হয়।”^{৫০}

জাপানী জাহাজের খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে হরিপ্রভা জানাচ্ছেন—

“১১/১২ টার সময় তাকেদাসানের জন্য উক্ত জাপানীদের সঙ্গে খাবার আসিল। আমার জন্য ভাত ও কারী। ভাত গুলি ভালো লাগছিল। জাপানে চাউল আঠা আঠা, খেতেও সুস্বাদু।”^{৫১}

হরিপ্রভার বিবরণীতেও দেখা যায় প্রথম সমুদ্র দর্শনে হরিপ্রভার উচ্ছ্বাসের চিত্র। সেই ছবির বর্ণনা দেবার প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—

“খাওয়ার পর ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে মুখ ধুইতে যাইয়া দেখি এখন জল ঘোর সবুজ-নীলাভ। বুঝলাম এবার সত্য সত্যই সমুদ্রে পড়িয়াছি। সমুদ্র দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল নিচে নীল জল উপরে নীল আকাশ।”^{৫২}

৯ নভেম্বর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে হরিপ্রভা ও উয়েমেন তাকেদা কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছান। রেঙ্গুন দ্বীপ পরিবেষ্টিত দেশ। সমুদ্রের পারেই রেঙ্গুন অবস্থিত। রেঙ্গুন থেকে হরিপ্রভাদের জাহাজের যাত্রাপথ ছিল পিনাঙ হয়ে, সিঙ্গাপুর অতিক্রম করে, হংকং পেরিয়ে জাপান। আর এই দীর্ঘ জলপথ বর্ণনা সূত্রে তিনি সংক্ষিপ্ত ও সংহত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন শহরের ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক, সংস্কৃতিক অবস্থানের চিত্র তুলে ধরেছেন। কখনও জাহাজে বসেই কিংবা কখনও জাহাজ থেকে নেমে শহরগুলি ঘুরে ঘুরে জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন হরিপ্রভা। হংকং দেশটির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানান—

“হংকং বেড়াতে নামিলাম। শহরটি একদিকে যেমন সুদৃশ্য তেমনি জাঁকজমকপূর্ণ পর্বতময় স্থান বলিয়া রাস্তাগুলোর কোনটা উঁচু কোনটা নীচু। ৫/৬ তলা পর্যন্ত উচ্চ বড় বাড়ি। নিম্নতলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত দোকান। রাস্তায় ট্রাম, রিকশা ও ডিন চেয়ার...।”^{৫৩}

১৩ ডিসেম্বর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে হরিপ্রভা লিখছেন তিনি জাপানের পোর্ট মোজিতে এসে পৌঁছান। জাপান দেশটির অন্তরাত্মা সন্ধান তৎপর হয়েছিলেন হরিপ্রভা কিন্তু বিদেশে গেলেও তিনি নিজের অন্তরে বহন করে চলেছিলেন নিজের স্বদেশকেই। তাই তাঁর রচনা জুড়ে যখন জাপানে বিভিন্ন দ্রষ্টব্য-স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গেই দেখি তিনি নিজের স্বদেশ ভারতের কথাও স্মরণ করেছেন।

হরিপ্রভা ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ গ্রন্থে বিভিন্ন সামাজিক মাত্রাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামাজিক মাত্রা গুলি হল যথাক্রমে—

১. জাপানের পারিবারিক জীবনচিত্র
২. জাপানের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবনা

৩. জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা

এই তিনটি সামাজিক মাত্রাকে আমরা হরিপ্রভার জাপান ভ্রমণকথা অনুসারে বর্ণনা করব।

১) জাপানের পারিবারিক জীবনচিত্র : হরিপ্রভা ও তাঁর পরিবার ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বী। বিশ শতকের সূচনাকালে দেখা যায় তাঁর পরিবারের চিন্তাধারা ছিল যুগের থেকে পৃথক। জাপান থেকে ভাগ্য অশেষে ভারতে আসা উয়েমেন তাকেদার সঙ্গে হরিপ্রভার আলাপ পরিচয় প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হলে পরিবারের সমর্থনেই তাঁদের সম্পর্ক বিবাহের পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে। হরিপ্রভার পরিবারের মতো জাপানের অধিবাসী উয়েমেন তাকেদার পরিবারও এই আন্তর্জাতিক দম্পতি জাপানে ফিরে এলে তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। হরিপ্রভা তাঁর জাপান ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণনায় বিভিন্ন জাপানি মানুষসহ তাঁদের পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন। হরিপ্রভা জাপানের পরিবারের উল্লেখ করতে গিয়ে পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন, কলকাতায় বসবাসকারী জাপানী মিঃ সিমিজসান ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে। আর এই সূত্রেই হরিপ্রভা জাপান দেশীয় মানুষদের শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখিয়েছেন। তাঁদের খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের পরিচয় দিয়েছেন হরিপ্রভা। জাপান দেশটি সম্পর্কে ভারতে বসবাসকারী জাপানিদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধেরও পরিচয় দিতে ভোলেননি তিনি।

হরিপ্রভা ও উয়েমেন তাকেদা জাপানে পৌঁছালে হরিপ্রভা মিলিত হন তাঁর শ্বশুরবাড়ির পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে। তাঁর শ্বশুরবাড়ির দেশটি ছিল গ্রামে। গ্রাম্য পরিবেশের পারিবারিক চিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে হরিপ্রভা দেখিয়েছেন পরিবারের সম্পর্ক, দেশের দূরত্ব অনুসারে কখনোই লঘু অথবা গুরু হয় না। পারিবারিক সম্পর্ক শাস্ত্রত। তাই ভৌগোলিক দূরত্ব কখনোই পারিবারিক সম্পর্কের বাধা হয়ে উঠতে পারে না। হরিপ্রভা ও উয়েমেন জাপানে ফিরলে সেখানের মানুষজন কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। নবদম্পতি এবং একই সঙ্গে বিদেশী বধূ হরিপ্রভাকে দেখার ও চেনার জন্য মানুষের আগ্রহের অন্ত ছিল না। জাপান পাশ্চাত্য দেশগুলির অনেক জিনিস শিক্ষণীয় বলে অনুসরণ করে চললেও তাঁরা নিজেদের স্বদেশীয় চিন্তা চেতনা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূলকে কখনো হারাতে দেননি। তাই দেখা যায় নয় বছর পর উয়েমেন তাকেদা তাঁর বধূকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলে সমগ্র পরিবার আপনজন সহ গ্রামবাসী মানুষেরা খুশি হয়ে ওঠেন। হরিপ্রভার বর্ণনায়—

“আজ নয় বৎসর পরে যে পিতামাতা ও আত্মীয়গণ বহুদিন পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া বিদেশে তাঁহার মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলেন ও সংবাদ পাইয়াও মিলিত হইবার আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ কত আনন্দিত হইলেন। চারিদিকে উপস্থিত সকলে ঘিরিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।”^৯

হরিপ্রভা তাঁর লেখা ভ্রমণ বিবরণীতে নিজ শাশুড়ি ঠাকুরাণীর মমতাময় রূপের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি অপত্য স্নেহ, সহানুভূতি ও সখ্যময়তা লাভ করেছিলেন। প্রথম জাপানে পৌঁছালে আমরা তাঁর শাশুড়ি মায়ের সঙ্গে পরিচিত হয় এইভাবে—

“আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর স্বহস্তে আমার খাবার প্রস্তুত করে দিলেন। শীতের জন্য বড় কষ্ট পাইতেছি ইত্যাদি বলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা প্রস্তুত করে দিলেন ও শীঘ্র শয়ন করিতে বলিলেন।”^{১০}

আবার ভ্রমণ বিবরণীর শেষ পর্যায়ে দেখা যায় পারিবারিক জীবনের মর্মস্পর্শী ছবি ফুটে উঠতে। চারমাস জাপানে থাকার পর পুত্র ও পুত্রবধূ উয়েমেন তাকেদা ও হরিপ্রভা তাকেদা উপনিবেশিক ভারতে ফিরে যাবার কালে হরিপ্রভার শাশুড়ি মা ভাবী বিচ্ছেদ-যন্ত্রনায় আকুল হয়ে অশ্রুপাত করেছেন হরিপ্রভার দীর্ঘ চারমাসের সময়ে জাপানে বসবাসকালে তিনি জাপান দেশীয় শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, দেওর, ভাতৃবধূ সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। সে সঙ্গে গ্রামবাসী মানুষেরা, শিশুরা, ইকুলে পড়া ছাত্র ও ছাত্রীরা প্রায় সবসময় তাঁকে ঘিরে থাকতেন। তাঁরা ভারত দেশটি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে তাঁকে নানান প্রশ্ন করতেন ও সবসময় তাঁর মনোরঞ্জননের বিশেষ চেষ্টায় থাকতেন। আবার ফেরা যাক উয়েমেন তাকেদার স্নেহময়ী মায়ের প্রসঙ্গে। হরিপ্রভা যখন স্বামী সহ পুনরায় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফিরে যাচ্ছেন সেই সময়ের শাশুড়ি মায়ের বিচ্ছেদ ব্যথা স্মরণ করে লিখেছেন—

“আসিবার সময় শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও এক ননদ তাঁহার পুত্র সহ কোবে পর্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিলেন। বিদায় কালে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন।...”^{১১}

হরিপ্রভা তাঁর শ্বশুরবাড়ির মানুষদের থেকে বাস্তবিক সরল ও আন্তরিক স্নেহ লাভ করেছিলেন। তাই তিনিও মনে মনে জাপানে থেকে যাবার ইচ্ছা পোষন করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে কোন অনিবার্য কারণ বশত তা সম্ভবপর না হওয়ায় জাপান ভ্রমণ বিবরণের একদম শেষে হরিপ্রভার কণ্ঠে শোনা যায় আক্ষেপধ্বনি। তিনি বলছেন—

“বিদেশে এমন সরল স্বভাবা স্নেহ পরায়ণতা শ্রদ্ধা ঠাকুরানী মা’র মতো যত্ন ও ভালোবাসা পাইয়া ইঁহা সহিত বাস করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়!”^{১২}

হরিপ্রভা জাপানের পারিবারিক পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সহ আলোচনা করার সূত্রে জানিয়েছেন, জাপানের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে ঘরের আভ্যন্তরীণ ও ঘরের বাহ্যিক জীবনে অংশগ্রহণ করেন। জাপানি মেয়েরা পরিবারের কৃষিকাজে হাত লাগান যেমন, তেমনি তাঁরা বাজার, দোকান, পোস্ট অফিস, স্টেশন সব জায়গাতেই সক্রিয় ভাবে কর্মশীল থাকেন। জাপানের পরিবার ও গৃহজীবনের অংশ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন হরিপ্রভা। আর এই সূত্রে তিনি ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন জাপানের দৈনন্দিন পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র—

“মেয়েরা সাধারণতঃ প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের দরজা গুলি খুলিয়া দেয়। তৎপর রন্ধন আরম্ভ হয়। ... ৮ টার সময় ছেলেরা সব স্কুলে যায়। মা সন্তানদের পুস্তকাদি ও মধ্যাহ্ন আহারের জন্য বেস্তো (ভাত কিছু মুলা ও অল্প তরকারি বা মাছ) একটি ছোট বাক্সে বেঁধে দেন। মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সময় সাধারণ পোষাকের উপর নীচের দিকে একটি ঘাগরার মতো পরে। গৃহকর্তা কয়েক মিনিট গৃহদেবতার পূজা করিয়া স্বকর্মে প্রস্থান করেন। মেয়েরা সংসারে অন্যান্য কার্যে মনোনিবেশ করেন, এই কাজগুলি সংসারের অর্থ আগমনের উপায় হয়।”^{১৩}

হরিপ্রভার জাপান ভ্রমণবিবরণী তাই বিশ শতকীয় জাপানের পরিবারজীবনের চিত্রের পরিচয় পাবার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২) জাপানের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবনা : হরিপ্রভা ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ গ্রন্থে জাপান দেশীয় সংস্কৃতির গভীর ও আন্তরিক পরিচয় দিয়েছেন। জাপানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে পেরেছিলেন জাপান দেশটির বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থানে ভ্রমণ করার মধ্য দিয়ে। হরিপ্রভা তাঁর দীর্ঘ চার মাস ব্যাপী প্রথম জাপান ভ্রমণে বিভিন্ন জাপানী পরিবারের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং জাপানের সংস্কৃতি সম্পর্কে বলাই বাহুল্য দীর্ঘসূত্রী অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। হরিপ্রভা লক্ষ্য করেছেন জাপানের মানুষদের মধ্যে বিনয় ও সহমর্মিতা বিদ্যমান। তাঁরা কখনই একে অপরকে সম্মান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বিনিময় করতে কুণ্ঠিত হন না। তাই হরিপ্রভা যখন তাঁর শ্বশুরবাড়ির মানুষদের মূলত গুরুজনদের ভারতীয় রীতি অনুসারে প্রণাম করেছেন তখন জাপানীয় ঐতিহ্য মেনে পরিবার ও আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ছোট বড়ো বয়সীরা নির্বিশেষে তাঁকে প্রতিনমস্কার জানিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রণামের রীতি ভারত দেশীয় রীতির থেকে কিছুটা ভিন্ন। হরিপ্রভা জানান এদেশের রীতি অনুসারে গুরুজন ও কনিষ্ঠ পরস্পরে সম্মান জানাবার উদ্দেশ্যে জানুর উপর উপবেশন পূর্বক মাথা অবনত করে একে অপরকে অভিবাদন জানান।

হরিপ্রভা জাপানের ধর্মীয়প্রথা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বলেছেন জাপানে মূলত বৌদ্ধ ও শিন্তো ধর্ম পালন করা হয়। তবে সেই সময় জাপানের আইসোলেশন পলিসি পরিত্যক্ত হওয়ায় ও ইউরোপীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ নানা ভাবে বৃদ্ধি হবার কারণে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। শিন্তো ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে হরিপ্রভা তাঁর গ্রন্থে জানাচ্ছেন –

“পরলোকস্থ মহাপুরুষ বীরগণকে, পরলোকবাসী আত্মাকে ইঁহারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে কারণ তাঁরা বিপদে দুঃখে যুদ্ধাদিতে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করিতেছেন।”^{১৪}

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শিন্তোধর্ম সম্বন্ধিত করে জাপান দেশজ ভক্তি ও ধর্মকে একত্রে মিলিত করে নিয়েছিল। পরলোকস্থ বীরাত্মাদের জন্য পুজোকে তাঁরা বলেন ‘মোকনশা’। পরলোকবাসীদের প্রতি ভক্তি, সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, কর্মে আসক্তি, জাপানীয় সংস্কৃতির যে মূলমন্ত্র তা হরিপ্রভার লেখা থেকে জানা যায়।

জাপানীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধতার মূলে আছে জাপানের মানুষের সৌন্দর্য চেতনার সুসামঞ্জস্য ও সুসংহত পরিপূরক ভাবনা। জাপানীয় ঘর বাড়ির আভ্যন্তরীণ সজ্জার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখবো তাঁদের ঘরগুলি মূলত আড়ম্বর শূন্য।

সাধারণ ও একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই তাদের গৃহসজ্জার মূল উপকরণ। হরিপ্রভা তাঁর জাপান ভ্রমণ প্রসঙ্গে এক জাপানি গৃহের বর্ণনায় বলছেন - সমগ্র ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছানো রয়েছে, তার উপর বসবার জন্য ছোট ছোট গোল বালিশের মতো ফুতন রাখা রয়েছে। এছাড়া ঘরে আর তেমন আসবাব নেই। ঘরের এক কোণে শোভা পাচ্ছে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিকভাবের চিত্র ও তাঁর নীচে একখানি দেরাজ রাখা হয়েছে। সেই দেরাজে স্থান পেয়েছে একটি জল পরিপূর্ণ পাত্র। পাত্রে বিভিন্ন জাপানি ফুল শোভা বৃদ্ধি করছে। সরল জীবনযাপন ও কপটশূন্যতাই জাপানের দেশীয় ঐক্যভাবনার মূল সূর। জাপানিরা স্বভাবত উৎসাহী, আনন্দ ভালোবাসে আবার কাজ ও শৃঙ্খলাও ভালোবাসে। তাই তাঁদের দেশ ক্রমেই হয়ে উঠেছিল সমগ্র এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশের মধ্যে একটি। হরিপ্রভা জানাচ্ছেন জাপানে প্রত্যেক বাড়ির আবশ্যিক অংশ রূপে বাগান থাকবেই বাড়ির সামনে। এতে তাঁদের দেশের সৌন্দর্য ও সম্পদ দুই বৃদ্ধি পায়। জাপান, প্রকৃতিকে তাদের জীবনদেবতা বলে চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভালোবেসে এসেছে। তাই জাপানে বসন্তকাল উপনীত হলে যখন চারিদিকে চেরী বৃক্ষগুলি পুষ্পবতী হয়ে ওঠে তখন সমগ্র জাপান উৎসবে মেতে ওঠে। এই উৎসবকে হরিপ্রভা চেরী উৎসব বলে চিহ্নিত করেছেন। চেরী উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হলো গেইসা জাপানি রমণীদের রঙ বেরঙের কিমানো ও সুন্দর সাজের মধ্য দিয়ে অপূর্ব নৃত্য পরিবেশনের পদ্ধতি। গেইসাদের নৃত্য এই চেরী ফুলের উৎসবকে অন্য মাত্রা দেয়। চেরী ফুল ফুটলে জাপানে ছোট বড়ো সকলে পরিবার পরিজনের সঙ্গে ভিড় করে প্রকৃতির সেই অপূর্বরূপ লীলা প্রত্যক্ষ করার জন্য।

হরিপ্রভা জাপানের বিভিন্ন বিখ্যাত মন্দিরগুলি ঘুরে দেখেছেন। স্বামী উয়েমেনের সঙ্গে বিভিন্ন জাপানি তীর্থস্থান গুলি ও প্রত্যক্ষ করেছেন। মন্দির, তীর্থস্থানগুলি হল প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশ্বস্ত নিদর্শন। জাপানের বিভিন্ন মন্দিরগুলি সেই ঐতিহ্যের তাৎপর্য প্রাচীনকাল থেকেই বহন করে আসছিল। জাপানে জাহাজ পৌঁছাবার পর হরিপ্রভা, তেনজিন সামার (ইনি একজন জাপানি যোদ্ধা ও মহাপুরুষ) দেবমন্দির দেখেছিলেন। হরিপ্রভা ও উয়েমেন আইএসই বা Ise নামক বিশেষ তীর্থে ভ্রমণ করেছিলেন। এটি নাগোয়া শহরের অনতিদূরেই অবস্থিত। জাপানের মন্দিরগুলির স্বতন্ত্রতা এখানেই তাঁরা নিজেদের দেশের অতীত গৌরবকে প্রদর্শনের স্থল রূপে মন্দিরগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন। সিন্তো ও বৌদ্ধ ধর্মের সামঞ্জস্যে সৃষ্ট মন্দিরগুলিতে জাপান যে চিন ও রূপ দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল সেই গৌরব স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন কামান, তলোয়ারসহ বিভিন্ন অস্ত্র প্রদর্শনের জন্য রাখতেন। Ise তীর্থেও হরিপ্রভা বিভিন্ন অস্ত্রের প্রদর্শন দেখেছিলেন আবার মন্দিরে অবস্থিত সুন্দর বাগান দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। হরিপ্রভা জাপানের বেশ কিছু মনোরম সৌন্দর্যের অধিকারী পার্কের উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে নাম করা যেতে পারে ‘আসাকু কোয়েন’, ‘উয়েনো’ প্রভৃতি উদ্যানের। ২১ জানুয়ারি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের তারিখ উল্লেখ করে হরিপ্রভা বর্ণনা দিচ্ছেন ‘নিক্কো’ নামক এক দুর্গম পর্বতময় স্থানের। সেখানে পর্বত ও জলপ্রপাত একত্রে মিলে প্রকৃতির সুন্দর রূপ দান করেছেন বলে হরিপ্রভার বর্ণনায় দেখা যায়। জাপানের পূর্বতন রাজধানী ও বিশেষ তীর্থস্থান কিয়েটো গেছেন তিনি। কিয়েটো বর্ণনায় বলছেন—

“জাপানের পূর্বতন রাজধানী কিয়াতো এঁদের পুণ্য তীর্থস্থান রূপে গন্য। এখানকার নানা কারু কার্য্য বিশিষ্ট বড় বড় ‘ওথেলা’ গুলি (দেব মন্দির) দর্শনীয়।”^{২৫}

জাপানি পুরোহিতেরাও ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ অংশ। আর এই পুরোহিতদের কথা উল্লেখ করে হরিপ্রভা বলছেন, জাপানে পুরোহিতকে বলা হয় ‘বোসান’। এঁরা মস্তক মুন্ডন করেন এবং মন্ত্রপাঠ সহকারে বড় ঘন্টা বাজিয়ে পূজা করেন। উপস্থিত লোকেরা পুরোহিত বা বোসানের মন্ত্র মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং পূজার মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠেন, ‘নামান্দাত’, ‘নামান্দাত’ অনেকটা হরিধ্বনির মতো শোনায়। এক্ষেত্রে শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো ‘নমো অমিতাভ’।

হরিপ্রভা জাপানি নারীদের কথা বলতে গিয়ে তাঁদের চুল বাঁধার সুন্দর ও বিচিত্র পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান জাপানের প্রথাগত মহিলাদের পোশাক ও পুরুষের পোশাক এক। তাঁরা নারী পুরুষ সকলেই কিমানো পড়ে। কিমানোর সঙ্গে মহিলারা ওবি পড়ে, এটি বেল্টের মতো জিনিস। জাপানিদের খাদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে হরিপ্রভা জানিয়েছেন, জাপানিরা বাঙালিদের মতোই ভাত প্রিয় জীব। তাঁরা ভাতের সঙ্গে অল্প তেল ও নাম মাত্র ঘী, মশলা দিয়ে সিদ্ধ করে মাছ ও মাংসের তরকারি রান্না করে খায়। হরিপ্রভা আরো বলছেন - “মূলা এদেশের প্রিয় খাদ্য। ...মূলা কাঁচা ও খায়, আবার

লবণ দিয়ে মাখিয়া কিছু শুকাইয়া এক স্থানে বন্ধ করিয়া রাখে। যখন পচিয়া যায় তখন আহার করে...।” জাপানিরা দুধ এবং ছানা দিয়ে মিষ্টি তৈরি করেন না, হরিপ্রভা জাপানে যে পরিবারে গেছিলেন সেখানে মিষ্টি হিসেবে চাল ও মটর ডালের উপকরণে পিঠার মতো মিষ্টি দ্রব্য খেয়েছিলেন। জাপানের সংস্কৃতির মূলে বৌদ্ধধর্মের সুদৃঢ় প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি জাপান তাঁর দেশীয় ঐতিহ্যের সামগ্রীসহ দেশীয় যোদ্ধাদের সম্মান করতে জানে। তাই জাপানে বৌদ্ধ ও সিন্তো ধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে জাপানকে প্রগতিশীল সৌন্দর্য চेतনার দেশ রূপে বিশেষ উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। হরিপ্রভার জাপান ভ্রমণবিবরণী ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ বাংলা ভাষায় জাপানের সমকালীন বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজ চेतনার পরিচয় প্রদানের সূত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যিক নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

৩) জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা : শিক্ষা সমাজের এক বিশেষ অঙ্গ। এই শিক্ষায় মানব মনে চेतনার সৃষ্টি করে। শিক্ষা ব্যবস্থা যত সমৃদ্ধ হবে, দেশ ও তত প্রগতিশীলতার দিকে যাত্রা করবে। এই সহজ সত্যটা জাপান বহুকাল আগেই বুঝেছিল। তাই জাপান শিক্ষার জন্য যত্নশীল হয়েছিল। হরিপ্রভা তাঁর গ্রন্থে জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেছেন। জাপানে সরকারি নিয়ম অনুসারে আট বছর বয়স হলে ছেলে মেয়ে সকলেই স্কুল যেতে বাধ্য বলে হরিপ্রভা উল্লেখ করেছেন। আট বছর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত তারা মায়ের কাছেই শিক্ষা পেতো সে সময়। ১৬ জানুয়ারি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে হরিপ্রভা একটি মেয়েদের স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন সাধারণ পাঠককে। হরিপ্রভার মতে জাপানে শুধু মাত্র পুঁথিপড়া বিদ্যা দেওয়া হয় না, রীতিমতো হাতে কলমে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলির পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে। হরিপ্রভা জানাচ্ছেন স্কুলটিতে ছোট ছোট বালিকাদের ভূগোল শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি স্বরূপ তাঁরা মাটি দিয়ে পাহাড় (ফুজিয়ান), নদী (সুমায়া) নির্মাণ করেন। গানের আকারে বালিকাদের বড় বড় নগর ও শহরের নাম সহ স্থানের বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হয়। তিন থেকে চার বছরের শিশুদের হাতে কাগজ ও রঙতুলি দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের কল্পনার বিকাশ ঘটে কাগজ ও রঙ তুলিকার সাহায্যেই। এভাবেই জাপান দেশে শিক্ষাকে কোন ভয়-ভীতির কারণ না করে উপভোগ্য করে তোলা হয়, এবং ছাত্র ছাত্রীরা, শিক্ষাকে তাঁদের অন্তরের কাজের সঙ্গেই সামিল করে নিতে কোনপ্রকার বাধা পায়না। ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ গ্রন্থে হরিপ্রভা শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখছেন—

“সংসারে উন্নত জীবন লাভ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে ও সন্তান-সন্ততি এবং দেশবাসীদের মানুষ করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার বুঝে কোনটি এখানে অভাব নাই। স্কুলটিতে রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, সাধারণ শরীরতত্ত্ব ইত্যাদি কলেজের পাঠ্য উন্নত বিষয় হইতে রন্ধনকার্য, ধোপার কাজ, গৃহাদি পরিষ্কার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানের কাজ, সেলাই, গানবাজনা, শিল্প কাজ, ড্রয়িং, নীতি শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।”^{১৬}

হরিপ্রভার ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের জাপান ভ্রমণ নিয়ে রচিত ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ নিঃসন্দেহে বাঙালি নারী লিখিত উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী। গ্রন্থটির মধ্য থেকে বিংশ শতাব্দীর ভারত ও জাপান দুই দেশের অবস্থান চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা নিঃসন্দেহে ভারত জাপান দুটি দেশের মৈত্রী সম্পর্কে আরো শ্রী দান করেছে। সেবার চার মাস জাপানে কাটিয়ে ১৩ এপ্রিল ওয়েমেনের সঙ্গে হরিপ্রভা দেশের উদ্দেশে রওনা হন এবং ২৫ মে ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখেন। এই চার মাসের অভিজ্ঞতা নিয়েই ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’। এর বাইরেও জাপান বিষয়ক আরও দুটি নিবন্ধ তিনি লিখেছিলেন, যা ডি এম লাইব্রেরির এই সংস্করণটিতে যুক্ত আছে। ‘জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা’ এবং ‘যুদ্ধ-জর্জরিত জাপানে’। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাকেদা-দম্পতি এরপর আরও দুবার জাপান যান। দ্বিতীয়বার ১৯২৪ সালে, তৃতীয়বার ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। এই তৃতীয়বারের অভিজ্ঞতার নির্যাস রয়েছে ‘যুদ্ধ-জর্জরিত জাপানে’ নিবন্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ও যুদ্ধ শেষ হবার পর কয়েক বছর মিলিয়ে মোট ৭ বছর সেবার তিনি জাপানে ছিলেন। যোগাযোগ হয়েছিল সে সময় জাপানে থাকা রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে। নেতাজীর অনুরোধে হরিপ্রভা টোকিও থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে বেশ কিছুদিন নিয়মিত রেডিও প্রচার পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হরিপ্রভা ও ওয়েমেন ভারতে ফিরে আসেন। ওয়েমেন সে বছরই জলপাইগুড়িতে মারা যান। হরিপ্রভা মারা যান আরও অনেক পরে, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ গ্রন্থটি ভারতীয় নারীদের বিদেশভ্রমণ বর্ণনা প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে ও জাপান ও ভারত

দুটি দেশের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী প্রেক্ষিতের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি বর্ণনায় একটি বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নিদর্শনের ভূমিকা পালন করছে তা বলাই যেতে পারে।

Reference:

১. তাকেদা হরিপ্রভা, *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা*, সম্পাদনা : মনজুরুল হক, সাহিত্যপ্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮
২. ঐ, পৃ. ৫৮
৩. ঐ, পৃ. ২৩
৪. ঐ, পৃ. ২৫
৫. ঐ, পৃ. ২৫
৬. ঐ, পৃ. ২৬
৭. ঐ, পৃ. ২৭
৮. ঐ, পৃ. ৩১
৯. ঐ, পৃ. ৩৬
১০. ঐ, পৃ. ৩৬
১১. ঐ, পৃ. ৫৫
১২. ঐ, পৃ. ৫৫
১৩. ঐ, পৃ. ৪৯
১৪. ঐ, পৃ. ৫২
১৫. ঐ, পৃ. ৪৩
১৬. ঐ, পৃ. ৪০